নবম অধ্যায়

জড় জাগতিক সবকিছু থেকে নিরাসক্তি

অবধূত ব্রাহ্মণ এখন কুরর পাখি প্রমুখ অন্য সাতজন গুরুর কথা বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি অন্য আরও একজন গুরুর কথাও বলেছেন, তা হল তাঁর নিজের দেহ।

কুরর পাখির কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন যে, আসক্তির ফলে দুঃখদুর্দশা সৃষ্টি হয়, তবে যে মানুষ অনাসক্ত এবং যার কোনও জড়জাগতিক সম্পদ নেই, তার পক্ষেই অনন্ত সুখ অর্জনের যোগ্যতা লাভ সম্ভব হয়।

অবধূত ব্রাহ্মণ মূর্খ অলস শিশুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হলে মানুষ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে আরাধনার যোগ্যতা লাভ করে এবং পরম উল্লাস উপভোগ করে।

যে কুমারী তার দু হাতে শুধুমাত্র একটি করে শাঁখা পরেছিল, তার কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়া গিয়েছিল যে, একাকী থাকাই ভাল এবং তাতেই মন দৃঢ়ভাবাপন্ন হয়। তার ফলেই মানুষের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে একাত্মভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়। একদা কয়েকজন লোক বালিকাটির পাণিপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছিল, যখন তার আত্মীয়স্বজন ঘটনাক্রমে কেউ বাড়িতে ছিল না। সে ভিতরে গিয়ে অনাহুত অতিথিদের জন্য খাদ্য প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ধান ভানতে শুরু করেছিল। সেই সময়ে তার হাতের শাঁখাগুলি ঠোকাঠুকি হয়ে শব্দ সৃষ্টি করছিল, এবং সেই শব্দ থামানোর জন্য একে একে হাতের শাঁখাগুলি ভেঙে ফেলেছিল, কেবল প্রত্যেক হাতে একটি করে শাঁখা বাকি ছিল। দুটি বা তার বেশি শাঁখা থাকলে যেমন শব্দ হতেই থাকে, তেমনই দুজন মানুষ যেখানেই থাকবে, সেখানে পরস্পরে কলহ এবং অনাবশ্যক বাক্যালাপ হবেই।

অবধূত ব্রাহ্মণ এক তীরন্দাজের কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তীরন্দাজটি এমনই মনোনিবেশ সহকারে তীর প্রস্তুত করছিল যে, তার পাশের রাস্তাটি দিয়ে রাজা চলে যাচ্ছেন, তা সে জানতেই পারেনি। ঠিক এইভাবেই, ভগবান শ্রীহরির আরাধনায় একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে মনঃসংযোগ করা অবশ্যই উচিত।

অবধূত ব্রাহ্মণ সাপের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, সাধু সর্বদা একাকী ভ্রমণ করবেন, কোনও পূর্বনির্ধারিত স্থানে বসবাস করবেন না, সকল সময়ে সতর্ক এবং গম্ভীর থাকবেন, তাঁর গতিবিধি প্রকাশ করবেন না, কারও কাছ থেকে সহযোগিতা চাইবেন না এবং অল্প কথা বলবেন।

যে মাকড়সা তার মুখ থেকে জাল বোনা শুরু করে এবং তারপরে তা থেকে সরে যায়, তার কাছে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানও তেমনই তাঁরই স্বরূপ থেকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং তারপরে নিজের মধ্যেই তা বিলীন করেন।

পেশস্কৃত ভ্রমরের মতো রূপ ধারণ করতে পারে যে ক্ষুদ্র কীট, তার কাছ থেকে অবধূত ব্রাহ্মণ শিক্ষালাভ করেন যে সাধারণ জীবও স্নেহ-ভালোবাসা, ঘৃণা এবং ভয়ের তাড়নায় যে বিষয়ে মনোনিবেশ করে থাকে, পরজন্মে তার সেই প্রকার জন্মলাভ ঘটে।

এই ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জড়জাগতিক শরীরটি জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হয়ে থাকে, তা লক্ষ্য করার ফলে, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের এই শরীরের প্রতি আসক্ত হওয়া অনুচিত এবং মানবজন্মের মাধ্যমে যে দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেছে, তা জ্ঞান অনুশীলনের পথে কাজে লাগিয়ে, জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনে যথাযথভাবে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

শ্লোক ১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎপ্রিয়তমং নৃণাম্ ।
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্ বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—সাধু ব্রাহ্মণ বললেন; **পরিগ্রহঃ**—অধিকারের প্রতি আসক্তি; **হি**—অবশ্যই; **দুঃখায়**—দুঃখ আনে; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **প্রিয়তমম্**—যা অতি প্রিয়; **নৃণাম্**—মানুষদের; **অনন্তম্**—অশেষ; **সুখম্**—সুখ; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **তৎ**—তা; **বিদ্বান্**—জ্ঞান লাভ করে; **যঃ**—যে কেউ; **তু**—অবশ্যই; **অকিঞ্চনঃ**—সেই আসক্তি থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

সাধু ব্রাহ্মণ বললেন—প্রত্যেকেই এই জড়জগতের মাঝে কোনও কোনও জিনিসকে তার খুবই প্রিয় বলে মনে করে থাকে, এবং ঐসব জিনিসের প্রতি আসক্তির ফলে, পরিণামে মানুষ দুঃখ পায়। এই বিষয়টি যে বুঝতে পারে, সে জড়জাগতিক সব অধিকারস্বত্ব পরিত্যাগ করে এবং সকল প্রকার আসক্তি বর্জনের ফলে সে অনন্ত সুখ শান্তির অধিকারী হয়।

শ্লোক ২

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত ॥ ২ ॥

স-আমিষম্—মাংস সমেত; **কুররম্**—এক বিশাল বাজপাখি; **জঘ্নুঃ**—তারা আক্রমণ করল; **বলিনঃ**—খুব বলবান; **অন্যে**—অন্যদের; **নিরামিষাঃ**—মাংসবিহীন; **তদা**—সেই সময়ে; **আমিষম্**—মাংস; **পরিত্যজ্য**—ত্যাগ করে; **সঃ**—সে; **সুখম্**—সুখ; **সমবিন্দত**—লাভ করল।

অনুবাদ

একদা এক ঝাঁক বড় বড় বাজপাখি শিকার খুঁজে না পেয়ে অন্য একটি দুর্বল বাজপাখির কাছে কিছুমাংস রয়েছে দেখতে পেয়ে, তাকে আক্রমণ করেছিল। তখন সেই বাজপাখিটি তার জীবন বিপন্ন হয়েছে বুঝে তার মাংসের টুকরোটি বর্জন করেছিল এবং তখন সে যথার্থ সুখ অনুভব করেছিল।

তাৎপর্য

প্রকৃতির গুণাশ্রিত পাখিরা হিংস্র হয়ে উঠে অন্য পাখিদের মেরে খেয়ে ফেলে কিংবা তাদের শিকার করা মাংস কেড়ে নিয়ে খায়। বাজপাখি, শকুনি এবং চিল জাতীয় পাখিরা এই ধরনের হয়ে থাকে। অবশ্যই, অন্যের প্রতি হিংসাত্মক আচরণের প্রবৃত্তি অবশ্যই বর্জন করা উচিত এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করা কর্তব্য, যার ফলে প্রত্যেক জীবকেই সমভাবাপন্ন অনুভব করতে শেখা যায়। সুখশান্তির এই পর্যায়ে জীব যখন উন্নীত হয়, তখন আর অন্যদের প্রতি ঈর্ষা বা হিংসা পোষণ করবার ইচ্ছা হয় না এবং কাউকেই শত্রু বলে মনে হয় না।

শ্লোক ৩

ন মে মানাপমানৌ স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্ ।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ ॥ ৩ ॥

ন—না; **মে**—আমার মধ্যে; **মান**—সম্মান; **অপমানৌ**—অসম্মান; **স্তঃ**—আছে; **ন**—নেই; **চিন্তা**—দুঃশ্চিন্তা; **গেহ**—গৃহী; **পুত্রিণাম্**—এবং সন্তানাদি; **আত্ম**—নিজের দ্বারা; **ক্রীড়ঃ**—ক্রীড়া করে; **আত্ম**—নিজের একাকী; **রতিঃ**—উপভোগ করে; **বিচরামী**—আমি ভ্রমণ করি; **ইহ**—এই জগতে; **বালবৎ**—শিশুর মতো।

অনুবাদ

গার্হস্থ্য জীবনে, পিতামাতারা সর্বদা তাঁদের গৃহ, সন্তানাদি এবং মান যশ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারে আমার কিছুই চিন্তা নেই। কোনও পরিবারের চিন্তা আমার মোটেই নেই, এবং আমি মান সম্মানেরও গ্রাহ্য করি না। আমি শুধুমাত্র আত্মার জীবনধারা উপভোগ করে থাকি, এবং চিন্ময় ভাবের স্তরে আমি প্রেমের যথার্থ অভিজ্ঞতা অনুভব করে থাকি। এইভাবেই পৃথিবীতে আমি শিশুর মতো বিচরণ করে থাকি।

শ্লোক ৪

দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ ।
যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥ ৪ ॥

দ্বৌ—দুই; এব—অবশ্যই; চিন্তয়া—উদ্বেগ থেকে; মুক্তৌ—মুক্ত; পরম-আনন্দে—পরম আনন্দে; আপ্লুতৌ—মগ্ন; যঃ—যেজন; বিমুগ্ধঃ—অজ্ঞ হয়; জড়ঃ—জড়বুদ্ধি; বালঃ—বালসুলভ; যঃ—যে; গুণেভ্যঃ—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীতে; পরম্—অপ্রাকৃত পরমেশ্বর ভগবান; গতঃ—লব্ধ।

অনুবাদ

এই জগতে দু'ধরনের মানুষ সর্বপ্রকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে পরম আনন্দে মগ্ন থাকে—যে জড়বুদ্ধি শিশুর মতো নির্বোধ এবং জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অতীত পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যে মনপ্রাণ অর্পণ করেছে।

তাৎপর্য

যারা জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভ করতে বিশেষ আগ্রহী হয়, তারা ক্রমশ দুর্দশাময় জীবন ধারায় নিমজ্জিত হতে থাকে, কারণ যখনই তারা প্রকৃতির বিধিনিয়মাদি সামান্যতম অবহেলা করে, তখনই পাপময় কর্মফল তাদের ভোগ করতে হয়। তাই জড়জাগতিক কাজকর্মে সুচতুর এবং উচ্চাভিলাষী মানুষেরাও নিয়ত উদ্বেগাক্রান্ত হয়ে থাকে, এবং মাঝে মাঝেই বিপুল দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তাদের পতিত হতে দেখা যায়। অবশ্য যারা হতবুদ্ধি এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধ, তারা যেন, মূর্খের স্বর্গে বাস করতে থাকে, আর যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করে থাকে, তারা দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং হতবুদ্ধি মানুষ আর ভগবদ্ভক্ত উভয়কেই শান্তিপ্রিয় বলা যেতে পারে, কারণ জড়জাগতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট মানুষদের সাধারণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে তারা মুক্ত থাকে। অবশ্য, এর অর্থ এমন নয় যে, ভগবদ্ভক্ত এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধ মানুষ

সমপর্যায়ভুক্ত। নির্বোধ মানুষের মানসিক শান্তি যেন প্রাণহীন পাথরের মতো, তবে ভগবদ্ভক্তের প্রশান্তি সর্বদাই যথার্থ শুদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুভূত হয়।

শ্লোক ৫

ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্ ।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু ॥ ৫ ॥

ক্বচিৎ—একদা; **কুমারী**—তরুণী বালিকা; **তু**—অবশ্য; **আত্মানম্**—সে নিজে; **বৃণানান্**—পত্নীরূপে আকাঙ্ক্ষায়; **গৃহম্**—বাড়িতে; **আগতান্**—এসেছিল; **স্বয়ম্**—নিজে; **তান্**—ঐ লোকগুলি; **অর্হয়াম্-আস**—পূর্ণ আতিথ্য সহকারে অভ্যর্থনা; **ক্ব অপি**—অন্য জায়গায়; **যাতেষু**—যখন তারা গিয়েছিল; **বন্ধুষু**—তার সকল আত্মীয়স্বজন।

অনুবাদ

একদা কোনও এক বিবাহযোগ্যা কুমারী বালিকা তার বাড়িতে একা ছিল, কারণ তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনেরা সেইদিন অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন লোক বাড়িতে এসে বিশেষ করে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা জানিয়েছিল। সে সকল প্রকার আতিথ্য সহকারে তাদের প্রীতি সম্পাদন করেছিল।

শ্লোক ৬

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব ।
অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ ॥ ৬ ॥

তেষাম্—অতিথি বর্গের; **অভ্যবহার-অর্থম্**—তাঁদের আহারার্থে; **শালীন্**—চাল; **রহসি**—একা থাকার জন্য; **পার্থিব**—হে রাজা; **অবঘ্নন্ত্যাঃ**—যে চাল ঝাড়ছিল; **প্রকোষ্ঠ**—তার হাতের; **স্থাঃ**—অবস্থিত; **চক্রুঃ**—সেগুলি সৃষ্টি করছিল; **শঙ্খাঃ**—শাঁখা; **স্বনম্**—শব্দ; **মহৎ**—খুব।

অনুবাদ

বালিকাটি অন্দরমহলে গিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল যাতে অনাহূত অতিথিরা কিছু আহার করতে পারেন। সে যখন চাল ঝাড়ছিল, তখন তার হাতের শাঁখা চুড়িগুলি পরস্পর ধাক্কায় খুব শব্দ হচ্ছিল।

শ্লোক ৭

সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ ॥ ৭ ॥

সা—সে; তৎ—সেই শব্দে; জুগুপ্সিতম্—লজ্জিত হয়ে; মত্বা—বোধ করে; মহতী—খুব বুদ্ধিমতী; ব্রীড়িতা—লজ্জিতা; ততঃ—তার হাত থেকে; বভঞ্জ—সে ভেঙে ফেলল; এক-একশঃ—একে একে; শঙ্খান্—শাঁখাগুলি; দ্বৌ দ্বৌ—দুটি করে; পাণ্যোঃ—তার দুই হাতের; অশেষয়ৎ—সে রেখে দিল।

অনুবাদ

বালিকাটি আশঙ্কা করেছিল যে, লোকগুলি হয়ত তাদের পরিবারবর্গকে দরিদ্র মনে করতে পারে যেহেতু কন্যাটি চাল ঝাড়বার মতো সামান্য কাজে ব্যস্ত হয়েছে। তাই খুব বুদ্ধিমতী বলেই, লজ্জিতা হয়ে বালিকাটি তার হাতের শাঁখাগুলি ভেঙে ফেলল, শুধুমাত্র প্রত্যেক হাতে দুটি করে শাঁখা রেখে দিল যাতে আর কোনও শব্দ না হয়।

শ্লোক ৮

উভয়োরপ্যভূদ্ ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্বশঙ্খয়োঃ ।
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্ ধ্বনিঃ ॥ ৮ ॥

উভয়োঃ—দুটি (হাত) হতে; অপি—তবুও; অভূৎ—হতে লাগলো; ঘোষঃ—শব্দ; হি—বস্তুত; অবঘ্নন্ত্যাঃ—ধান্য-কুট্টনরতার; স্ব-শঙ্খয়োঃ—তাঁর কঙ্কণদ্বয় হতে; তত্র—তখন; অপি—বস্তুত; একম্—একটি মাত্র; নিরভিদৎ—সে বিচ্ছিন্ন করল; একস্মাৎ—সেই একটি অলঙ্কার হতে; ন—না; অভবৎ—উৎপন্ন হল না; ধ্বনিঃ—কোন শব্দ।

অনুবাদ

অতঃপর, কুমারী ধান কুটতে থাকলে তার উভয় হাতের দুটি করে কঙ্কণের ক্রমাগত ঘর্ষণে শব্দ হতে লাগলো। তাই সে উভয় হাত থেকে একটি করে কঙ্কণ খুলে রাখলে পর উভয় হাতের একটি মাত্র কঙ্কন হতে আর কোন শব্দ উৎপন্ন হল না।

শ্লোক ৯

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম্ ।
লোকাননুচরন্নেতান্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ॥ ৯ ॥

অস্বশিক্ষম্—আমার নিজের চোখে দেখেছি; **ইমম্**—এই; **তস্যাঃ**—বালিকাটির; **উপদেশম্**—শিক্ষা; **অরিম্-দম**—হে শত্রুদমনকারী; **লোকান্**—জগৎগুলি; **অনুচরন্**—পরিভ্রমণ; **এতান্**—এই সমস্ত; **লোক**—পৃথিবীর; **তত্ত্ব**—সত্য; **বিবিৎসয়া**—জানবার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

হে শত্রুদমনকারী, এই জগৎ প্রকৃতি সম্পর্কে নিত্য শিক্ষা লাভের মাধ্যমে আমি সারা জগৎ পরিভ্রমণ করে চলেছি, এবং তাই আমি স্বয়ং এই বালিকাটির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করছি।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ ঋষি এখানে যদুরাজের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁর কোনও তাত্ত্বিক জ্ঞান নেই এবং সেই সম্পর্কে কিছু বলছেন না। বরং, সারা পৃথিবীতে ভ্রমণের মাধ্যমে তীক্ষ্ণদর্শী ও চিন্তাশীল ব্রাহ্মণ স্বয়ং উল্লিখিত সমস্ত গুরুবর্গের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। তাই, আপনাকে ভগবানের মতো সর্বজ্ঞরূপে উপস্থাপিত না করে, তিনি বিনম্রভাবে বুঝিয়েছেন যে, তাঁর ভ্রমণের মাধ্যমেই এই সকল শিক্ষা তিনি বিশ্বস্ততা সহকারে অর্জন করেছেন।

শ্লোক ১০

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্ বার্তা দ্বয়োরপি ।
এক এব বসেত্তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ ॥ ১০ ॥

বাসে—বাসভবনে; **বহূনাম্**—অনেক লোকের; **কলহঃ**—ঝগড়া; **ভবেৎ**—হবে; **বার্তা**—বাক্যালাপ; **দ্বয়োঃ**—দু'জন; **অপি**—এমন কি; **একঃ**—একাকী; **এব**—অবশ্যই; **বসেৎ**—বাস করা উচিত; **তস্মাৎ**—অতএব; **কুমার্যাঃ**—কুমারী বালিকার; **ইব**—মতো; **কঙ্কণঃ**—শাঁখা।

অনুবাদ

যখন বহু লোক এক জায়গায় বাস করে, তখন সেখানে নিঃসন্দেহে কলহ-বিবাদ হবে। আর যদি দু'জন মাত্র লোকও একসাথে বাস করে, তা হলে চটুল বাক্যালাপ এবং মতভেদ হবে। অতএব, সংঘাত বর্জনের জন্যই, একাকী বসবাস করা উচিত, যা আমরা তরুণী বালিকার শাঁখার দৃষ্টান্ত থেকে শিখতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এই কাহিনীতে বর্ণিত তরুণী বালিকাটির পতি ছিল না বলে, গৃহকর্ত্রী রূপে তার দায়িত্ব

সম্পন্ন করবার জন্য তার হাতের শাঁখাগুলি খুলে ফেলেছিল, যাতে প্রত্যেক হাতে একটি মাত্র শাঁখাই থাকে। ঠিক সেইভাবেই, জ্ঞানযোগ অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতির প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যোগাভ্যাসরত ঋষিদের একাকী বসবাস করতে হয় এবং সকল প্রকার অন্যান্য সঙ্গ বর্জন করতে হয়। যেহেতু জ্ঞানীরা মানসিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে থাকেন, তা হলে অবশ্যই অন্তহীন তর্ক বিতর্ক এবং তাত্ত্বিক বিষয়াদি নিয়ে কলহ বিবাদ একত্রে বসবাসকারী অনেক জ্ঞানী মানুষদের মধ্যে হতেই থাকবে। সুতরাং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে তাদের পৃথকভাবে বাস করাই উচিত। অপরদিকে, যে রাজকন্যা'র বিবাহ কোনও সম্ভ্রান্ত রাজপুত্রের সঙ্গে হয়েছে তাকে অসংখ্য অলঙ্কারাদি সহ সুসজ্জিত হয়ে তার পতির প্রেম-ভালবাসা অর্জনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে হয়। সেইভাবেই, ভগবানের পবিত্র নামের মধুর ধ্বনির আস্বাদনের উদ্দেশ্যে সমবেত বৈষ্ণবগণের অগণিত অলঙ্কারদি সহ ভক্তিদেবী আপনাকে সুসজ্জিত করে থাকেন। যেহেতু শুদ্ধ বৈষ্ণবেরা অভক্তদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্যতা স্থাপন করেন না, তাই বলা যেতে পারে যে, তারা একাকী নিঃসঙ্গভাবেই বাস করেন, এবং সেইভাবে তাঁরাও এই শ্লোকটির উদ্দেশ্য সার্থক করে থাকেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবদের মধ্যে কোনও কলহ বিবাদ হতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয় না বললেও চলে, তাঁরা যথার্থ নিরাসক্তির স্তরে বিরাজ করেন বলে, মুক্তিলাভ অথবা রহস্যময় যোগশক্তি লাভ করতেও চান না। যেহেতু তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভক্ত, তাই তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/৩৪) বলা হয়েছে—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্
মৎপাদ সেবাভিরতা মদীহাঃ ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥

"যে শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবাকার্যে অনুরক্ত এবং সর্বদাই যে আমার চরণকমলের সেবায় আত্মনিয়োজিত থাকে, সে কখনই আমার সাথে লীন হয়ে যেতে অভিলাষ করে না। যে ভক্ত নিঃসংশয়ে ভক্তিপথে নিয়োজিত থাকে, সে সততই আমার দিব্যলীলা এবং কার্যকলাপ মহিমান্বিত করতে চায়।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন—"কাহিনীটির মধ্যে বর্ণিত তরুণী বালিকাটি তার দুই হাতে মাত্র একটি করে শাঁখা রেখেছিল, যাতে শাঁখাগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কোনও শব্দ না হতে

পারে। ঠিক সেইভাবেই, যারা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিভাবাপন্ন নয়, তাদের সঙ্গ বর্জন করাই উচিত।" এই যথার্থ শিক্ষাটি গ্রহণ করাই উচিত। শুদ্ধ বৈষ্ণব সকল সময়ে শুদ্ধ এবং কলঙ্কহীন চরিত্রসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠেন। তবে, যেখানেই অভক্তদের সমাবেশ ঘটে, নিঃসন্দেহে সেখানে ঈর্ষাদ্বন্দ্বমূলক সমালোচনার মাধ্যমে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের নিন্দামন্দ করা হয়ে থাকে, এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বর্জন করে যারাই বাস্তব জগতের বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হয়, তারা নিতান্তই দর্শন চর্চার নামে প্রভূত পরিমাণে বিরক্তিকর কোলাহল সৃষ্টি করতেই থাকে। অতএব, যেখানে বৈদিক যথার্থ রীতি অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের যথাযথ উপাসনা হয়ে থাকে, সেখানেই থাকা উচিত। যদি সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তনে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তা হলে সেখানে পারস্পরিক শুদ্ধ সঙ্গলাভের কোনই বিঘ্ন ঘটে না। অবশ্য, যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষ আসে, সেখানে সামাজিক আদানপ্রদানে অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

তাই ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে যারা বিরূপ, তাদের সঙ্গ বর্জন করাই উচিত; নতুবা জীবনের পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে হতাশাচ্ছন্ন হতেই হবে। ভগবদ্ভক্ত সংসর্গে যিনি নিয়ত দিনযাপন করেন, তিনি যথার্থই নিঃসঙ্গতার সুফল অর্জন করতে পারেন। যেখানে ভগবৎ প্রীতি সাধন করাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়, তেমন সংসর্গে বসবাস করলেই মানুষ বহুলোকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট জড়জাগতিক বাসনাদি চরিতার্থ করবার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিকূল পরিবেশের কুফল পরিহার করতে পারেন। কুমারী বালিকাটির শাঁখাগুলির দৃষ্টান্ত থেকেই ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমানের মতো এই শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নরূপ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

অসজ্জনৈস্তু সংবাসো ন কর্তব্যঃ কথঞ্চন ।
যাবদ্ যাবচ্চ বহুভিঃ সজ্জনৈঃ স তু মুক্তিদঃ ॥

"ভগবদ্ভক্ত নয় এমন মানুষদের সঙ্গে কোনও পরিবেশেই বসবাস করা অনুচিত। বরং বহু ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে অবস্থান করাই উচিত, কারণ ভক্তসঙ্গই মুক্তিপ্রদান করে।"

শ্লোক ১১

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১ ॥

মনঃ—মন; **একত্র**—এক জায়গায়; **সংযুঞ্জ্যাৎ**—সংযুক্ত করে; **জিত**—জয় করে; **শ্বাসঃ**—শ্বাসক্রিয়া; **জিত**—জয় করে; **আসনঃ**—যোগাসন ভঙ্গীগুলি; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তির মাধ্যমে; **অভ্যাস-যোগেন**—যোগ প্রক্রিয়ার বিধিবদ্ধ আচরণের মাধ্যমে; **ধ্রিয়মাণম্**—মনস্থির করার ফলে; **অতন্দ্রিতঃ**—অতি যত্ন সহকারে।

অনুবাদ

যোগাসন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অভ্যাসের মাধ্যমে এবং শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে, বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় যোগচর্চার ফলে অনাসক্তির সাহায্যে মন স্থির করতে পারা যায়। এইভাবেই সযত্নে যোগাভ্যাসের একমাত্র লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা উচিত।

তাৎপর্য

সমস্ত জড়জাগতিক বস্তুই নিঃশেষিত হতে বাধ্য, তা লক্ষ্য করে মানুষের বৈরাগ্য অর্থাৎ অনাসক্তি আয়ত্ত করা উচিত। বর্তমান যুগে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপকীর্তনের প্রক্রিয়া বলতে যে বিধিবদ্ধ যৌগিক প্রক্রিয়া অনুমোদিত হয়েছে, তা অভ্যাস করাই কর্তব্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, অবধূত ব্রাহ্মণ ভক্তিমিশ্র অষ্টাঙ্গযোগ অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য অষ্ট বিধি সম্পন্ন বিস্ময়কর অলৌকিক যোগ প্রক্রিয়া অভ্যাসেরই অনুমোদন করেছেন।

বিস্ময়কর অলৌকিক যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, মনকে সংযত করতে না পারলে, অনিয়ন্ত্রিত অসংযত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মনের মাধ্যমে জড়জগৎ উপভোগ করা সহজসাধ্য হয় না। জড়জগতটিকে উপভোগ করবার বাসনা এমনই প্রবল যে, মন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে দিগ্বিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। তাই বলা হয়েছে—*ধ্রিয়মানম্*—পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবনের লক্ষ্য ধার্য করে মনকে অবশ্যই সুনিবদ্ধ করতে হবে। *সমাধি* নামে অভিহিত মনঃসংযোগের চরম সার্থক অবস্থায়, বাইরের এবং অন্তরের দৃষ্টি ক্ষমতার মধ্যে আর কোনও পার্থক্য থাকে না, যেহেতু মানুষ তখন সর্বত্রই পরম তত্ত্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে পারে।

বিস্ময়কর অলৌকিক যোগ প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে উপবেশন করতে হয়, এবং তারপরে শরীরের মধ্যে বিভিন্নপ্রকার বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। যখন শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন দেহ মধ্যস্থ বিভিন্ন প্রকার বায়ুগুলির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভরশীল মনকেও উচ্চতর চেতনার স্তরে অনায়াসেই সুস্থিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু মনকে যদিও ক্ষণকালের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, তবু ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনার দ্বারা পরাভূত হলে মন আবার হারিয়ে যাবে। এইভাবে,

এই শ্লোকটি জড়জাগতিক মায়ামোহ থেকে অনাসক্তি তথা বৈরাগ্যের প্রাধান্য উপস্থাপন করেছে। *অভ্যাসযোগের* মাধ্যমে অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের বিধিবদ্ধ অনুশীলনের সাহায্যে, আর তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগপ্রক্রিয়া রূপে *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥

"সকল যোগীদের মধ্যে যিনি গভীর বিশ্বাসে দিব্য প্রেমভক্তি সহকারে আমাকে আরাধনা করেন, তিনিই যথার্থ যোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থাকেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী রূপে পরিগণিত হয়ে থাকেন।"

শ্লোক ১২

যস্মিন্ মনো লব্ধপদং যদেতৎ
শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্মরেণূন্ ।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
বিধূয় নির্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্ ॥ ১২ ॥

যস্মিন্—যেখানে (পরমেশ্বর শ্রীভগবান); **মনঃ**—মন; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **পদম্**—স্থায়ী অবস্থান; **যৎ এতৎ**—সেই মন; **শনৈঃ শনৈঃ**—ক্রমশ, ধীরে ধীরে; **মুঞ্চতি**—ত্যাগ করে; **কর্ম**—ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম; **রেণূন্**—কলুষতা; **সত্ত্বেন**—সত্ত্ব গুণের দ্বারা; **বৃদ্ধেন**—যার বল বৃদ্ধি হয়েছে; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **চ**—ও; **বিধূয়**—পরিত্যাগ করে; **নির্বাণম্**—ধ্যানযোগের মাধ্যমে লক্ষ্য বস্তুর সাথে দিব্য অবস্থান; **উপৈতি**—লাভ করে; **অনিন্ধনম্**—ইন্ধন ব্যতীত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মন নিবদ্ধ হলে তখন তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুস্থির অবস্থা লাভ করার ফলে, জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কলুষিত বাসনাদি থেকে মন মুক্তিলাভ করে; এইভাবে সত্ত্বগুণের প্রভাব শক্তিশালী হলে তখন রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে, এবং ক্রমশ সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে থাকে। যখন মন জড়াপ্রকৃতির ইন্ধন থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে, তখন তার জড়জাগতিক অস্তিত্বের আগুন নিভে যায়। তখন মানুষ তার ধ্যানের মূল লক্ষ্য স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভের দিব্যস্তর প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের পারমার্থিক অগ্রগতির পথে বিপুল বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হতে থাকে, এবং তার ফলে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিপদ থাকে। যারা বাস্তব জীবনে মনস্তত্ত্বের কথা জানে, তারা বোঝে যে, অনিয়ন্ত্রিত মনের দ্বারা কত বিপদ ঘটে এবং তাই তারা নিয়ত মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার চেষ্টা করতে থাকে। যদি মানুষ জড়া প্রকৃতির রজো ও তমোগুণাবলীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে, তা হলে জীবনধারা খুবই মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। মনঃসংযম, এবং তার মাধ্যমে জড়জাগতিক ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই জীবনে যথার্থ প্রগতির একমাত্র পন্থা। এই শ্লোকটির মধ্যে *যস্মিন্* শব্দটি শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বোঝায়, যিনি সকল সুখশান্তির উৎস। স্বপ্নহীন নিদ্রার মাঝে যেমন নিরাকার সত্তার অনুভব হয়, মনের জড়া প্রকৃতিগুলি বর্জন করলে তেমন অনুভূতির মধ্যে বিলীন হওয়া বোঝায় না। এই শ্লোকটিতে তাই বলা হয়েছে— *সত্ত্বেন বৃদ্ধেন*—সত্ত্বগুণের আচরণে মানুষকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং তবেই ক্রমশ চিন্ময় পারমার্থিক স্তরে ক্রমশ উন্নত হওয়া সম্ভব হবে, সেখানেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গলাভের মাধ্যমে জীবন যাপন করা যায়।

শ্লোক ১৩

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিদ্ বহিরন্তরং বা ।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত-
মিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে ॥ ১৩ ॥

তদা—তখন; **এবম্**—এইভাবে; **আত্মনি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অবরুদ্ধ**—দৃঢ়নিবদ্ধ; **চিত্তঃ**—মন; **ন**—করে না; **বেদ**—জানে; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **বহিঃ**—বাইরের; **অন্তরম্**—ভিতরে; **বা**—কিংবা; **যথা**—যেমন; **ইষু**—তীরের; **কারঃ**—কারিগর; **নৃপতিম্**—রাজা; **ব্রজন্তম্**—যাচ্ছিলেন; **ইষৌ**—তীরের দিকে; **গত-আত্মা**—নিবিষ্ট; **ন দদর্শ**—দেখেনি; **পার্শ্বে**—ঠিক তার পাশেই।

অনুবাদ

এইভাবে, যখনই পরমতত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণভাবে মানুষ অভিনিবিষ্ট হয়, তখন সে আর কোনও ভাবেই অন্তরে কিংবা বাহিরে কিছুমাত্র দ্বৈতভাব বা কোনও দ্বিধা অনুভব করে না। তাই এখানে একজন তীরন্দাজের

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, সেই মানুষটি একটি তীর যথাযথ সোজাভাবে তৈরি করার কাজে এমনই অভিনিবিষ্ট হয়ে কাজ করছিল যে, স্বয়ং রাজাও তার ঠিক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে কিংবা অনুভব করতে পারেনি।

তাৎপর্য

সকলেই জানে যে, কোনও রাজা যখন উন্মুক্ত রাজপথ দিয়ে যান, তখন তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণার জন্য ভেরী, দামামা এবং অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রাদি বাজিয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা হতে থাকে, আর তাঁর সঙ্গে সৈন্যদল এবং তাঁর পারিষদবর্গের সদস্যেরাও থাকেন। এই অবস্থায়, এই ধরনের রাজকীয় জৌলুষ সেই তীরন্দাজটির কর্মশালার ঠিক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও, সেইদিকে সে লক্ষ্যপাতও করেনি, কারণ একটি তীরকে সঠিকভাবে সোজা এবং সুতীক্ষ্ণ করে তোলার জন্য তার নির্ধারিত কর্তব্য পালনে একান্তভাবেই আত্মমগ্ন হয়ে ছিল। তেমনই, পরম তত্ত্বস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে যেব্যক্তি সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে থাকে, সে আর কখনই জড়জাগতিক মায়ামোহের দিকে ফিরে তাকায় না। এই শ্লোকটিতে *বহিঃ* অর্থাৎ 'বাইরের' শব্দটির দ্বারা খাদ্য, পানীয়, মৈথুনসুখ, এবং এই ধরনের সব কিছু জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অগণিত বিষয়বস্তুর কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ এইগুলি বদ্ধজীবাত্মার সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি জড়জাগতিক দ্বৈত সত্তার দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে।

অন্তরম্ অর্থাৎ "আভ্যন্তরীণ" শব্দটির দ্বারা ভবিষ্যতের জড়জাগতিক পরিস্থিতির আশাভরসা এবং নানা স্বপ্নময় কল্পনাবিলাস অথবা পূর্বতন ইন্দ্রিয় উপভোগের স্মৃতিচারণ ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। সর্বত্রই পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি যিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা সমস্ত মায়ামোহ সবই একেবারেই বর্জন করতে পারেন। একেই বলা হয় *মুক্তিপদ*, অর্থাৎ মুক্তিলাভের মর্যাদা। এই পদমর্যাদায় উপনীত হলে, তখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়বস্তুগুলির প্রতি আকর্ষণ কিংবা অনাসক্তি, কিছুই থাকে না; বরং, তখন পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় প্রেমময় চিন্তামগ্ন হয়ে থাকার প্রবণতা সৃষ্টি হয়, এবং ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার প্রবল বাসনা জাগে। যে মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব উপলব্ধি বর্জন করে, তাকে অবশ্যই নানা প্রকার মানসিক কল্পনার রাজ্যে অনাবশ্যক বিচরণ করে চলতেই হবে। যা কিছুর অস্তিত্ব বিরাজ করে রয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিরই পটভূমিতে ভিত্তিস্বরূপ পরমতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান যে উপলব্ধি করতে পারে না, সে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া যে কিছু আছে, সেই

ভ্রান্ত ধারণার বিপর্যস্ত হয়েই থাকে। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই ভগবানের মধ্যে থেকেই উৎসারিত হয়, এবং তিনি সব কিছুর প্রভু। বাস্তবে বিরাজমান পরিস্থিতি-পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধির এই হল সহজ সূত্র।

শ্লোক ১৪

একচার্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ ।
অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণ ॥ ১৪ ॥

এক—একাকী; চারী—বিচরণকারী; অনিকেতঃ—বসবাসহীন; স্যাৎ—উচিত; অপ্রমত্তঃ—অতি সতর্ক; গুহা-আশয়ঃ—নিভৃত; অলক্ষ্যমাণঃ—লক্ষ্য বহির্ভূত অবস্থায়; আচারৈঃ—তার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে; মুনিঃ—কোনও ঋষি; একঃ—নিঃসঙ্গ; অল্প—সামান্য; ভাষণঃ—কথাবার্তা।

অনুবাদ

কোনও ঋষিতুল্য মানুষ অবশ্যই একাকী দিনযাপন করেন এবং সর্বদাই নির্দিষ্ট বসবাস না রেখেই নিয়ত পরিভ্রমণ করতে থাকেন। সদাসতর্ক হয়ে তিনি নিঃসঙ্গ দিনযাপন করেন এবং সকলের অলক্ষ্যে কাজ করে থাকেন। সঙ্গীবিহীন হয়ে ভ্রমণ করেন বলেই, তাকে প্রয়োজনের বেশি কথা বলতে হয় না।

তাৎপর্য

কুমারী বালিকার শাঁখাচুড়ি বিষয়ক উল্লিখিত কাহিনী প্রসঙ্গে বোঝা যায় যে, যোগ প্রক্রিয়া অনুশীলনে সাধারণ মুনিঋষিদেরও এইভাবে সংঘর্ষ তথা কোলাহল থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে একাকী বসবাস করাই শ্রেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণ যোগ প্রক্রিয়াদি অনুশীলনে নিয়োজিত মানুষদেরও পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গ সংসর্গ রাখা অনুচিত। এই শ্লোকটিতে বিশেষ করে সাপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ মানুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই সাপ নিজেকে একান্তে গুটিয়ে রাখে। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিক্ষালাভ করি যে, সাধু পুরুষদের কখনই সাধারণ জড়জাগতিক মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান রাখাও তাঁর অনুচিত এবং অন্য সকলের অলক্ষ্যে তাঁর চলাফেরা তথা পরিভ্রমণ করা উচিত।

আমাদের অসন্তোষের কারণ জড়জাগতিক অস্তিত্বের মাঝে আমাদের আত্মনিয়োগ। এইভাবে আত্মনিয়োজিত থাকার ফলে আমাদের জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন করেই হোক, জড়জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেমভালবাসার প্রতি আমাদের আমূল আসক্তি

বর্জন করতেই হবে। মানুষকে অনাসক্তির অনুশীলন করতেই হবে, এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পদ্ধতি-প্রক্রিয়াদির বিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের মাধ্যমেই মানুষের শুভপ্রদ জীবনধারার সূচনা হতে পারবে। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে মানুষের জীবনধারা সুনিবদ্ধ করে তুলতে পারলে, তবেই মানুষ আত্ম-উপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। অন্যভাবে বলতে হলে, ব্রহ্মচারী কিংবা সন্ন্যাসী অথবা বিবাহিত জীবনধারায় গৃহস্থ হয়ে, সম্পূর্ণভাবে মৈথুনাসক্তির জীবন বর্জন করে অথবা তা সুনিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে সৎ জীবন যাপনের পন্থা গ্রহণ করে মানুষকে যথার্থ সুখশান্তির পথ বেছে নিতে হবেই। মানুষের জীবনে কাজকর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে, বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে পারমার্থিক অগ্রগতি সাধন করা কঠিন হবে। জড় জগতে দীর্ঘকালের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেম ভালবাসার আসক্তি গড়ে ওঠে। দিব্য জগতের অনুভূতি অর্জনের পথে ঐগুলি সবই বিপুল বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে, এবং ঐগুলি অনুধাবন করতে থাকলে পারমার্থিক বিকাশ লাভ অতি কঠিন হয়ে উঠবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত এবং উপদেশাবলীর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান করেছেন কিভাবে ভক্তের পক্ষে কোনও কাজ করা উচিত কিংবা অনুচিত, এবং সেই সকল নীতি উপদেশাবলীর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষের জীবনে পরম সার্থকতার পথ সুগম হয়ে ওঠে। সুতরাং, এইভাবেই মানুষকে সাধারণ সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধ্বে বিচরণ করা শিখতে হবে, কারণ ঐগুলিই মানুষকে অনর্থক ইন্দ্রিয় পরিতোষণের দিকে ধাবিত করে থাকে।

শ্লোক ১৫

গৃহারম্ভোঽহি দুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ১৫ ॥

গৃহ—ঘরের; **আরম্ভঃ**—গঠন; **হি**—অবশ্য; **দুঃখায়**—দুঃখ নিয়ে আসে; **বিফল**—নিষ্ফল; **চ**—ও; **অধ্রুব**—অনিত্য; **আত্মনঃ**—জীবের; **সর্পঃ**—সাপ; **পরকৃতম্**—অন্যের দ্বারা তৈরি; **বেশ্ম**—গৃহ; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **সুখম্**—সুখে; **এধতে**—উন্নতি করে।

অনুবাদ

যখন কোনও মানুষ একটা অস্থায়ী অনিত্য জড় দেহের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও একটা সুখী গৃহকোণ তৈরী করতে চায়, তখন তা নিষ্ফল হয় এবং দুঃখ দুর্দশারই সৃষ্টি করে। অবশ্য সাপ অন্য কারও তৈরি বাড়িতে ঢুকে সুখেই দিনযাপন করতে থাকে।

তাৎপর্য

সাপের নিজের ঘরবাড়ি তৈরি করার কোনও কৌশলই জানা নেই, কিন্তু অন্য প্রাণীদের তৈরি উপযুক্ত বাসাতেই বসবাস করে দিন কাটিয়ে দেয়। তাই বাড়িঘর তৈরি করবার ঝঞ্ঝাটে সে জড়িয়ে পড়ে না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা যদিও বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন, প্রচুর মোটরগাড়ি, বিমান ইত্যাদি আবিষ্কার এবং তৈরি করতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রম করে থাকে, তবুও শেষ পর্যন্ত এই সব কিছুই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত বৈষ্ণবদেরই সুবিধার জন্য গড়ে উঠেছে। কর্মীরাই সকল সময়ে ঐ সব কষ্ট স্বীকার করবে, আর ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ঐ সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা নিবেদনে অর্পণ করে থাকেন। ভক্তগণ জীবনের পরম সার্থকতা অর্জনে আগ্রহী হয়ে থাকেন বলেই জড়জাগতিক প্রগতির জন্য নিজেরা কোনও সংগ্রাম করেন না। অপর পক্ষে, প্রাচীন কালের কৃচ্ছ্রতাময় জীবনচর্যা অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করতেও তাঁরা চান না। ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য যথাসম্ভব সুন্দরভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা অনুশীলন; তাই ভক্তেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোরম অট্টালিকাগুলি এবং সকল প্রকার জাগতিক ঐশ্বর্যসম্পদ সবই গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু কোনটিতেই তাঁদের নিজেদের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না; তবে তাঁরা শুধুমাত্র চিন্তা করতে থাকেন কিভাবে সেগুলি ভগবানের সেবায় নিবেদন করা যায়। যদি কেউ সেইগুলি নিজের উপভোগের জন্য কাজে লাগাতে চায়, তা হলে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিমূলক পর্যায় থেকে অধঃপতিত হতে হয়। জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা যৌগিক প্রক্রিয়ার নামে শুধুমাত্র তাদের মৈথুন শক্তি বৃদ্ধির মতলবে উৎসাহবোধ করতে থাকে কিংবা বৃথাই তাদের পূর্বজন্মের কর্ম স্মরণ করতে চায়। এইভাবে, অলৌকিক যোগচর্চার মাধ্যমে অফুরন্ত ইন্দ্রিয় উপভোগের চেষ্টায়, ঐসব মানুষ মানবজীবনের যথার্থ লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ১৬

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসৃষ্টং স্বমায়য়া ।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ ।
এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥

একঃ—একাকী; **নারায়ণঃ**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **দেবঃ**—দেবতা; **পূর্ব**—পূর্বে; **সৃষ্টম্**—সৃষ্টি হয়েছে; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর নিজ শক্তির মাধ্যমে; **সংহৃত্য**—তাঁর নিজের মধ্যে প্রত্যাহারের মাধ্যমে; **কাল**—সময়ের; **কলয়া**—কল্প অনুসারে; **কল্প-**

অন্তে—প্রলয় কল্পের পরে; ইদম্—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা; একঃ—একাকী; এব—অবশ্য; অদ্বিতীয়ঃ—একমাত্র; অভূৎ—হলেন; আত্ম-আধারঃ—যিনি সকলের উৎস ও শক্তির আধার; অখিল—সকল শক্তির; আশ্রয়ঃ—আধার।

অনুবাদ

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীনারায়ণ সকল জীবেরই আরাধ্য দেবতা। কোনও প্রকার সাহায্য ছাড়াই, তাঁর নিজ শক্তি বলে তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রলয়কালে তাঁর স্বপ্রকাশরূপ মহাকালের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ সাধন করেন এবং তিনি স্বয়ং সকল জীবগণসহ ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু নিজ মধ্যেই আবার বিলীন করেন। এই কারণেই, তাঁরই অনন্ত সত্তা সকল শক্তির উৎস এবং আধার স্বরূপ বিরাজমান রয়েছে। সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্তা স্বরূপ সূক্ষ্ম প্রধান শক্তি ভগবানের মাঝেই সুরক্ষিত থাকে এবং এইভাবেই তাঁর সত্তা হতে এই শক্তি ভিন্ন সত্তা নয়। প্রলয়পর্বের শেষে ভগবান একমাত্র সত্তা রূপে বিরাজিত থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবানের স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং প্রলয় ব্যবস্থাটিকে মাকড়সার জাল তৈরি এবং তা থেকে নিজে সরে আসার প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে এবং সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ের পরবর্তী ২১ সংখ্যক শ্লোকে বিবৃত হয়েছে। 'এক' শব্দটি 'একমাত্র' অর্থে এই শ্লোকে দু'বার প্রয়োগ করা হয়েছে, তার দ্বারা দৃঢ়প্রত্যয় করা হয়েছে যে, একমাত্র একজন পরম পুরুষোত্তম ভগবান রয়েছেন এবং যত প্রকার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কার্যক্রম, এবং তৎসহ চিন্ময় দিব্যলীলা, তা সবই একমাত্র ভগবানেরই শক্তিবলে সংঘটিত হয়ে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, এই শ্লোকটিতে কারণার্ণবশায়ী শ্রীবিষ্ণু, অর্থাৎ কারণ সমুদ্রে শয়ানাবস্থায় বিরাজিত মহাবিষ্ণুর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। *আত্মাধার* এবং *অখিলাশ্রয়* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীনারায়ণ সকল অস্তিত্বের উৎস অর্থাৎ আশ্রয়। *আত্মাধার* বলতে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবানের স্বশরীরই সব কিছুর আশ্রয়স্থল। মহাবিষ্ণু প্রকৃতপক্ষে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ, যাঁর শরীর থেকেই জড়জগৎ এবং চিদ্‌জগতে অভিব্যক্ত অগণিত শক্তি প্রকাশ বিরাজমান রয়েছে। তাই *ব্রহ্মসংহিতা* অনুসারে, এই সমস্ত অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মজ্যোতি অর্থাৎ চিন্ময় আলোকচ্ছটার মাঝেই অবস্থান করে আছে, আর সেই জ্যোতিরও প্রকাশ ভগবানের দিব্য শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই ঈশ্বর অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা।

শ্লোক ১৭-১৮

কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু ।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥ ১৮ ॥

কালেন—কালের মাধ্যমে; **আত্ম-অনুভাবেন**—যা ভগবানের আপন শক্তি; **সাম্যম্**—সমতা রক্ষা মাধ্যমে; **নীতাসু**—অনীত হয়ে; **শক্তিষু**—জড়া শক্তিসমূহ; **সত্ত্ব-আদিষু**—সত্ত্ব প্রভৃতি জড় গুণাবলী; **আদি-পুরুষঃ**—নিত্য শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবান; **প্রধান-পুরুষ-ঈশ্বরঃ**—প্রকৃতির নির্বিকার 'প্রধান' রূপের এবং সকল জীবের পরম নিয়ন্তা; **পর**—দেবতাদের মুক্ত জীবসত্তার; **অবরাণাম্**—সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মাগণের; **পরমঃ**—পরমশ্রেষ্ঠ আরাধ্য বস্তু; **আস্তে**—আছে; **কৈবল্য**—মুক্ত সত্তা; **সংজ্ঞিতঃ**—কালক্রমের মাধ্যমে যা সূচিত হয়; **কেবল**—জড়জাগতিক কলুষতামুক্ত শুদ্ধ; **অনুভব**—উপলব্ধির অভিজ্ঞতা; **আনন্দ**—আনন্দ; **সন্দোহঃ**—সামগ্রিকতা; **নিরুপাধিকঃ**—জড়জাগতিক পরিচিতিমূলক সম্বন্ধ-সম্পর্ক বিবর্জিত।

অনুবাদ

যখন পরমেশ্বর ভগবান মহাকালের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর আপন শক্তির অভিপ্রকাশ করেন এবং সত্ত্বগুণাদির মতো তাঁর জড়জাগতিক শক্তিসমূহ পরিচালিত করেন, তখন তিনি প্রকৃতির নির্বিকার 'প্রধান' রূপ নামে অভিহিত শক্তিরাজির পরম নিয়ন্তা হয়ে থাকেন। তাছাড়া সমস্ত মুক্ত পুরুষ, দেবতাগণ ও সাধারণ জীবত্মাসহ সকল সত্তারই তিনি পরমারাধ্য লক্ষ্য হয়ে থাকেন। ভগবান সর্ব প্রকার জড়জাগতিক উপাধি থেকে নিত্য বিবর্জিত সত্তা রূপে বিরাজ করেন, এবং চিদানন্দের পূর্ণতা নিয়েই তাঁর সেই সত্তা, যাঁর দর্শনের উদ্দেশ্যে মানুষ তাঁর দিব্যরূপের প্রতি দৃষ্টিপাতের অনুশীলন করে। এইভাবেই ভগবান 'মুক্তি' শব্দটির সম্পূর্ণ ভাবার্থ উদ্‌ঘাটিত করে থাকেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় যেব্যক্তি মনোনিবেশ করে থাকে, সে জড়জাগতিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠার তরঙ্গাঘাত থেকে অচিরে স্বস্তি লাভ করে, কারণ ভগবানের দিব্য রূপ যে কোনও প্রকার জাগতিক কলুষতা অথবা উপাধি-পরিচয় থেকে সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত। স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা যুক্তিহীন ধারণা পোষণ করে যে, ভগবান তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেই রূপায়িত হয়ে রয়েছেন এবং অন্য কোনও প্রকার ভিন্ন স্বরূপ তিনি ধারণ করেন না। তারা বৃথাই কল্পনা করে থাকে যে, তারা

বিশ্বসত্তার মাঝে তাদের আপন ব্যক্তিত্ব বিলীন করে দিতে পারে এবং একেবারে পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত সত্তা অর্জন করতে পারে। অবশ্য, *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাবনা অনুযায়ী, পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ তত্ত্ব নন, বরং তিনি সকল প্রকার সবিশেষ দিব্য গুণাবলীতে পরিপূর্ণভাবেই ভূষিত। জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দিয়ে তাঁর নিকৃষ্ট শক্তি গড়ে উঠেছে, এবং সর্বগুণসম্পন্ন যে মহাকাল তার উপরে বিভিন্ন গুণাদি নির্ভর করে রয়েছে, তাই হল ভগবানের স্বরূপ অভিব্যক্ত। এইভাবেই, জড়া অভিব্যক্তি ভগবান সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন, আর তা সত্ত্বেও তা থেকে সম্পূর্ণভাবে অসংস্পৃক্তভাবে বিরাজ করেন। যে সকল বদ্ধজীব ভগবানের নিকৃষ্ট সৃষ্টি আত্মসাৎ করে উপভোগ করতে চায়, তারা পরমেশ্বর ভগবানেরই অভিলাষে তেমনভাবে সক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়, এবং তাই তারা অনিত্য জড়জগতের কৃত্রিম ভোক্তা হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়জাগতিক সকল প্রকার রূপই একান্তভাবে নিত্য শাশ্বত আত্মার আবরণ মাত্র, তখন জড়জাগতিক আসক্তির নির্বুদ্ধিতা পরিহার করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি একাত্মতা অনুভব করতে থাকে। তখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করা কিংবা শ্রীভগবৎ-সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া, কোনটাই তার স্বরূপ সত্তার মর্যাদার অনুকূল নয়। তার যথার্থ প্রকৃতি ভগবানের সেবক রূপে দাসত্ব স্বীকার করা। ভগবানের সেবা নিত্য শাশ্বত অভিব্যক্তি, এবং তা সচ্চিদানন্দময় অনুভূতিসম্পন্ন, আর সেই ধরনের সেবা মনোভাবের শক্তির মাধ্যমেই মানুষ মুক্তিলাভ করে এবং তার সকল কাজকর্ম মহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। সেই ধরনের প্রেমভক্তিপূর্ণ ভগবৎ সেবার মাধ্যমেই নিত্যসুখ অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে, এবং তার মাধ্যমেই মানুষ *কেবলানুভবানন্দসন্দোহ* পর্যায়ে ক্রমশ উন্নীত হতে থাকে, অর্থাৎ ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ আকৃতি দর্শনের পরমানন্দময় সাগরে অবগাহন করতে থাকে।

শ্লোক ১৯

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্ ।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম ॥ ১৯ ॥

কেবল—শুদ্ধ; **আত্ম**—তাঁর আপন সত্তার; **অনুভাবেন**—শক্তির দ্বারা; **স্ব-মায়াম্**—তাঁর নিজ শক্তি; **ত্রি**—তিন; **গুণ**—গুণাবলী; **আত্মিকাম্**—সম্বলিত; **সংক্ষোভয়ন্**—সংক্ষুব্ধ করার মাধ্যমে; **সৃজতি**—প্রকাশ করেন; **আদৌ**—সৃষ্টির সময়ে; **তয়া**—সেই শক্তির দ্বারা; **সূত্রম্**—সেই শক্তির বিশেষভাবে পরিচিত মহত্তত্ত্ব; **অরিন্দম্**—হে শত্রুদমনকারী।

অনুবাদ

হে অরিন্দম, সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দিব্যশক্তিকে মহাকাল রূপে প্রসারিত করেন, এবং জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দ্বারা রচিত তাঁর জড়া শক্তিকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

কেবল শব্দটির অর্থ 'শুদ্ধ' এবং তা থেকে বোঝা যায় যে, ভগবানের *কালশক্তি* অর্থাৎ মহাকাল তাঁর স্বশরীর থেকে অভিন্ন এক দিব্য শক্তি। এখানে যদুরাজকে *অরিন্দম্* অর্থাৎ শত্রুদমনকারী রূপে ব্রাহ্মণ সম্ভাষণ করেছেন। তা থেকে বোঝায় যে, মায়া অর্থাৎ মায়াময় সৃষ্টি সম্পর্কে এখানে যে আলোচনা হয়েছে, তা সত্ত্বেও রাজার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ ভগবানের অবিচল ভক্ত রূপে তিনি কাম, ক্রোধ ও লোভ নামক জীবনের প্রকৃত শত্রুগুলিকে নিশ্চিতরূপে দমন করতে সক্ষম, কারণ ঐগুলিই মানুষকে মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ করে রাখে। *সূত্রম্* শব্দটি মহত্তত্ত্ব বোঝায়, কারণ মনিরত্নাদি যেমন সূত্রে গাঁথা থাকে, তেমনই বহু জড়জাগতিক সৃষ্টিতত্ত্বও মহত্তত্ত্বের সূত্রে নির্ভর করে থাকে। *প্রধান* অর্থাৎ জড়জাগতিক ভারসাম্য রক্ষার পরিস্থিতির মাঝে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের কোনও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান শ্রীকপিলদেব তাঁর সাংখ্য দর্শন বিষয়ক উপদেশাবলীর মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান প্রকৃতির নির্বিকার সত্তা পুনর্জাগরিত করেন এবং তার মাধ্যমেই সৃষ্টি অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃতির যে অভিব্যক্ত সৃষ্টি রূপ, যার মাঝে কর্মাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মগুলি উদ্দীপিত হতে থাকে, তাকেই *মহত্তত্ত্ব* বলা হয়, যা এই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে।

যদি কেউ বেদান্ত দর্শনের নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে ভগবানের মায়াময় সৃষ্টির প্রভাব বর্জন করতে সচেষ্ট হয়, এবং সেইভাবে ভগবানের অনন্ত চেতনাকে কৃত্রিমভাবে বদ্ধজীবের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য চেতনার সঙ্গে সমতুল্য বিবেচনা করতে চান, তা হলে সেই বিশ্লেষণ বাস্তব সত্যের বহু দূরবর্তী সিদ্ধান্তেই প্রতিপন্ন হবে। *স্ব-মায়াম্* শব্দটি এই শ্লোকে বোঝায় যে, বদ্ধজীবকে যে মায়াবলে আচ্ছন্ন রাখা হয়েছে, তা সর্বদাই ভগবানের অধীনস্থ শক্তি এবং তিনি অপরাজেয় চেতনার অধিকারী এবং তিনি অনন্ত এবং তিনিও পুরুষসত্তা।

শ্লোক ২০

তামাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখম্ ।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥ ২০ ॥

ত্বাম্—মহত্তত্ত্ব; আহুঃ—তাঁরা বলেন; ত্রিগুণ—জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য; ব্যক্তিম্—কারণরূপে অভিব্যক্ত; সৃজন্তীম্—সৃষ্টি করে; বিশ্বতঃ-মুখম্—মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নানা বিভিন্ন বিষয়াদি; যস্মিন্—মহত্তত্ত্বের মধ্যে; প্রোতম্—সূত্রে আবদ্ধ; ইদম্—এই; বিশ্বম্—ব্রহ্মাণ্ড; যেন—যার দ্বারা; সংসরতে—জড়জাগতিক অস্তিত্বের রূপ গ্রহণ করে; পুমান্—জীব।

অনুবাদ

মহর্ষিগণের মতানুসারে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের যা ভিত্তি, এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা থেকে অভিব্যক্ত হয়, তাকে বলা হয় সূত্র কিংবা মহত্তত্ত্ব। বাস্তবিকই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মহত্তত্ত্বের উপরেই নির্ভর করে রয়েছে, এবং এর শক্তিবলেই জীব জড়জাগতিক অস্তিত্ব উপভোগ করে থাকে।

তাৎপর্য

মহাবিশ্বের অভিব্যক্তি অবশ্যই এক বাস্তব সত্য, কারণ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তথা পরম বাস্তব তত্ত্ব থেকেই তার উৎপত্তি। তবে, জড়জাগতিক পৃথিবী অনিত্য অস্থায়ী এবং তা সমস্যায় পরিপূর্ণ। বদ্ধ জীব নির্বোধের মতো এই নিকৃষ্ট সৃষ্টির অধিপতি হতে চেষ্টা করে এবং তার ফলে তার যথার্থ সুহৃৎ যে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সঙ্গলাভের সুযোগ হারায়। এমনই অবস্থায়, তার একমাত্র কাজ হয় ইন্দ্রিয় উপভোগ, এবং তাই তার যথার্থ জ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২১

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

যথা—যেমনভাবে; ঊর্ণ-নাভিঃ—মাকড়সা; হৃদয়াৎ—তার মধ্যে থেকে; ঊর্ণাম্—সুতা; সন্তত্য—বিস্তার করে; বক্ত্রতঃ—তার মুখ থেকে; তয়া—সেই সুতার দ্বারা; বিহৃত্য—উপভোগ করে; ভূয়ঃ—পুনরায়; তাম্—সেই সুতা; গ্রসতি—সে গ্রাস করে; এবম্—এইভাবে; মহা-ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

যেভাবে মাকড়সা তার নিজের মধ্য থেকে তার মুখ দিয়ে জালের সুতা বিস্তার করে, কিছুকাল তাই নিয়ে খেলা করে এবং অবশেষে তা গ্রাস করে নেয়, তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর নিজ সত্তার ভিতর থেকে তাঁর আপন শক্তি বিস্তার করে থাকেন। সেইভাবেই ভগবান মহাবিশ্বের অভিব্যক্তি নিয়ে সৃষ্টিজাল বিস্তার করেন, তাঁর উদ্দেশ্য বিধানে তার উপযোগ করেন এবং অন্তিমকালে সম্পূর্ণভাবে তা তিনি আপনার মধ্যে প্রত্যাহার করে নেন।

তাৎপর্য

যেজন বুদ্ধিমান, সে মাকড়সার মতো সামান্য প্রাণীর কাছ থেকেও দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারে। সেইভাবেই, কৃষ্ণভাবনামৃত উপলব্ধির জন্য দৃষ্টি প্রসারিত রাখলে পারমার্থিক দিব্যজ্ঞান সর্বত্রই লক্ষ্য করতে পারা যায়।

শ্লোক ২২

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া ।
স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্ ॥ ২২ ॥

যত্র যত্র—যেখানেই; **মনঃ**—মন; **দেহী**—বদ্ধ জীব; **ধারয়েৎ**—বদ্ধ করে; **সকলম্**—সম্পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে; **ধিয়া**—বুদ্ধি সহকারে; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশে; **দ্বেষাৎ**—ঈর্ষাবশে; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **বা অপি**—অন্যভাবে; **যাতি**—সে যায়; **তৎ তৎ**—সেই ভাবে; **স্বরূপতাম্**—বিশেষ রূপে অবস্থানের মাধ্যমে।

অনুবাদ

যদি প্রেম, ঘৃণা কিংবা ভয়ের বশে কোনও বদ্ধজীব তার মন ও বুদ্ধি সহকারে কোনও বিশেষ শারীরিক অবয়ব ধারণের বাসনায় মনোনিবেশ করে থাকে, তা হলে যেমন রূপ লাভের জন্য সে অভিনিবিষ্ট হয়েছে, অবশ্যই সেই রূপটি সে অর্জন করে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে, মানুষ যদি নিরন্তর পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের চিন্তায় মনোনিবেশ করে থাকে, তা হলে সে এমন একটি চিন্ময় শরীর লাভ করবে তা অবিকল ভগবানেরই মতো। *ধিয়া* শব্দটি অর্থাৎ 'বুদ্ধির দ্বারা' বোঝায় মানুষের মনে কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ বিচারবুদ্ধির বিশ্বাস, এবং তেমনই *সকলম্* শব্দটির দ্বারা মনের একাগ্র অভিনিবেশ বোঝায়। ঐ ধরনের একাগ্রচিত্ত মনোনিবেশের সাহায্যে, অবশ্যই মানুষ পরজন্মে নিজের গভীর চিন্তার অনুকূল অবিকল রূপ অর্জন করতে পারে। কীট পতঙ্গের রাজ্য থেকে এই দৃষ্টান্তটি লাভ করা যায়, তা নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৩

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাম্ তেন প্রবেশিতঃ ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্ ॥ ২৩ ॥

কীটঃ—পোকা; **পেশস্কৃতম্**—ভ্রমর; **ধ্যায়ন্**—চিন্তা করতে করতে; **কুড্যাম্**—তার চাকের মধ্যে; **তেন**—সেই ভ্রমরের দ্বারা; **প্রবেশিতঃ**—বাধ্য হয়ে প্রবেশ করতে হলে; **যাতি**—সে যায়; **তৎ**—ভ্রমরটির; **সাত্মতাম্**—সেই রূপলাভে; **রাজন্**—হে রাজা; **পূর্ব-রূপম্**—পূর্বের শরীর; **অসন্ত্যজন্**—ত্যাগ না করে।

অনুবাদ

হে রাজা, একদা একটি ভ্রমর বলপূর্বক একটি দুর্বল কীটকে তার বাসার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল এবং সেখানে তাকে বন্দী করে রেখেছিল। নিদারুণ ভয়ে দুর্বল কীটটি নিরন্তর তার বন্দীত্বের জন্য ভ্রমরটির কথা গভীর ভাবে চিন্তা করত, এবং তার শরীরটি ত্যাগ না করা সত্ত্বেও, সে ক্রমশ সেই ভ্রমরটির মতোই জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে মানুষ যে ভাবধারা নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করতে থাকে, ক্রমশ সেই রকম জীবনই সে লাভ করে।

তাৎপর্য

নিম্নরূপ প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে—দুর্বল পতঙ্গটি যেহেতু এই কাহিনীর মধ্যে শারীরিক ক্ষেত্রে তার দেহ পরিবর্তন করেনি, তা হলে কেমন করে বলা যেতে পারে যে, ভ্রমরটির মতোই সে জীবনধারা আয়ত্ত করেছিল? প্রকৃতপক্ষে, কোনও বিষয়ে একাদিক্রমে কারও চেতনা অভিনিবিষ্ট হয়ে থাকলে ক্রমশ সেই বিষয়টির গুণাবলীও চেতনাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। প্রবল আতঙ্কে ক্ষুদ্র কীটের মানসিকতা সেই বিরাটাকার ভ্রমরটির আচরণ বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়াকলাপের চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে থাকত এবং তাই সে ভ্রমরটির জীবনধারার বৈশিষ্ট্যে মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই ধরনের মনঃসংযোগের ফলে, বাস্তবিকই সে পরজন্মে একটি ভ্রমরের শরীর লাভ করেছিল।

তেমনই, আমরা যদিও বদ্ধজীব, তা হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় আমরা গভীরভাবে চেতনা নিবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হলে, এই শরীর পরিত্যাগ করবার আগেই আমরা মুক্ত সত্তা অর্জন করতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সবকিছু, সেই ধারণার মাধ্যমে পারমার্থিক স্তরে যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দৃঢ়নিবদ্ধ হয়, তখনই আমাদের বহিরাবরণ স্বরূপ অনিত্য দেহটির প্রতি অনাবশ্যক সচেতনা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হই, এবং তার ফলে বৈকুণ্ঠধামের দিব্যলীলা প্রসঙ্গে আমরা আত্মমগ্ন হতে পারি। এইভাবে মৃত্যুবরণের পূর্বেই মানুষ নিজেকে পারমার্থিক দিব্য স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হতে পারে এবং মুক্তাত্মা পুরুষেরই মতো জীবন উপভোগ করতে সমর্থ হয়। কিংবা, যদি কেউ নির্বোধ মূর্খ হয়, তা হলে ইহজীবনেই শূকর বা কুকুরের মতো নিয়ত আহার, নিদ্রা আর মৈথুন সুখময় জীবনধারার কথায় মগ্ন হয়ে থাকার

ফলে ঠিক পশুর মতোই জীবন লাভ করে। কিন্তু আত্মসচেতনতা অর্জনের বিজ্ঞানতত্ত্ব উপলব্ধি এবং আমাদের গভীর ধ্যানমগ্নতার ভবিষ্যৎ ফললাভের উদ্দেশ্যেই বস্তুত মানব জীবন নির্ধারিত হয়েছে।

শ্লোক ২৪

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; গুরুভ্যঃ—গুরুদেববর্গের কাছ থেকে; এতেভ্যঃ—এই সব থেকে; এষা—এই; মে—আমার দ্বারা; শিক্ষিতা—শিক্ষাপ্রাপ্ত; মতিঃ—জ্ঞান; স্ব-আত্মা—নিজ শরীর থেকে; উপশিক্ষিতাম্—সুশিক্ষিত; বুদ্ধিম্—জ্ঞান; শৃণু—কৃপাপূর্বক শ্রবণ করুন; মে—আমার কাছ থেকে; বদতঃ—আমি যা বলছি; প্রভো—হে রাজা।

অনুবাদ

হে রাজা, এই সকল গুরুবর্গের কাছ থেকে আমি বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছি। এখন কৃপা করে শুনুন, আমার নিজ শরীর থেকে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, তা বর্ণনা করে বোঝাচ্ছি।

শ্লোক ২৫

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতুঃ
বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্যুদর্কম্ ।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি
পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ ॥ ২৫ ॥

দেহঃ—শরীর; গুরুঃ—পারমার্থিক গুরুদেব; মম—আমার; বিরক্তি—অনাসক্তির; বিবেক—এবং যে বুদ্ধি সাহায্য করে; হেতুঃ—কারণ; বিভ্রৎ—পালন করে; স্ম—অবশ্যই; সত্ত্ব—অস্তিত্ব; নিধনম্—বিনাশ; সতত—সর্বদা; আর্তি—দুঃখকষ্ট; উদর্কম্—ভবিষ্যত পরিণাম; তত্ত্বানি—এই জগতের তত্ত্ব; অনেন—এই শরীর দিয়ে; বিমৃশামি—আমি স্মরণ করি; যথা—যদিও; তথা অপি—তা সত্ত্বেও; পারক্যম্—পরের অধিকারে; ইতি—এইভাবে; অবসিতঃ—স্থিরচিত্ত হয়ে; বিচরামি—আমি চারদিকে পরিভ্রমণ করি; অসঙ্গঃ—আসক্তিবিহীন হয়ে।

অনুবাদ

জড় দেহটিও আমার পারমার্থিক গুরু কারণ এরই মাধ্যমে আমি অনাসক্তি শিক্ষালাভ করে থাকি। সৃষ্টি এবং বিনাশের অধীনস্থ বলেই, এই দেহটি শেষ

পর্যন্ত নিয়তই কষ্টভোগ করতে থাকে। তাই, শিক্ষাদীক্ষা লাভের জন্য আমার শরীর নিয়োজিত করা হলেও, আমি সর্বদা স্মরণে রাখি যে, এই দেহটিকে শেষ পর্যন্ত অন্য সকল উপাদানেই আত্মসাৎ করে নেবে এবং তাই নিরাসক্ত হয়ে, আমি এই জগতে ভ্রমণ করতে থাকি।

তাৎপর্য

যথা তথাপি শব্দগুলি এই শ্লোকে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই দেহটির মাধ্যমে ইহজগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের বিপুল উপযোগিতা লাভ করা যায়, তা সত্ত্বেও সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, এই দেহের ভবিষ্যৎ সর্বদাই অসুখকর এবং অবধারিতভাবেই দুঃখে পরিপূর্ণ। মৃত্যুর পরে, দেহের সৎকার করা হলে, তা আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়; নির্জন স্থানে হারিয়ে গেলে, এই দেহটি শিয়ালে-শকুনে খেয়ে নেয়; আর যদি মনোরম শবাধারের মধ্যে রেখে সমাধিস্থ করা হয়, তা হলে দেহটি বিগলিত হয়ে নগণ্য কীটপতঙ্গের আহারে পরিণত হয়ে যায়। তাই এই দেহটিকে *পারক্যম্* বলা হয়েছে, অর্থাৎ তা "শেষ পর্যন্ত অন্যের দ্বারা আত্মসাৎ হয়ে থাকে"। অবশ্য, এই দেহটিকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সযত্নে রক্ষা করাও দরকার যাতে কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্য সাধন করা যায়, তবে তার জন্য অনর্থক স্নেহ মমতা কিংবা আসক্তি পোষণের কোনও প্রয়োজন নেই। দেহটির জন্ম এবং মৃত্যু অবধারন করলে, মানুষ *বিরক্তি-বিবেক* অর্থাৎ অনাবশ্যক বিষয়বস্তুগুলি থেকে নিজেকে অনাসক্ত রাখার বুদ্ধি অর্জন করতে পারে। *অবসিত* শব্দটি বোঝায় স্থিরচিত্ত হয়ে ওঠা। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সকল বাস্তব সত্য সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষকে স্থির আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে হবে।

শ্লোক ২৬

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্
পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্ ।
স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ
সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্মঃ ॥ ২৬ ॥

জায়া—পত্নী; **আত্মজা**—পুত্রকন্যা; **অর্থ**—ধনসম্পদ; **পশু**—গৃহপালিত জীবজন্তু; **ভৃত্য**—দাসদাসী; **গৃহ**—ঘর; **আপ্ত**—আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব; **বর্গান্**—এই সকল শ্রেণীর; **পুষ্ণাতি**—পোষণ করে; **যৎ**—দেহ; **প্রিয়চিকীর্ষয়া**—প্রীতিসাধনের বাসনায়; **বিতন্বন্**—প্রসারিত করে; **স্ব-অন্তে**—মৃত্যুকালে; **স-কৃচ্ছ্রম্**—বহু সংগ্রামের মাধ্যমে; **অবরুদ্ধ**—সঞ্চিত; **ধনঃ**—সম্পত্তি; **সঃ**—এই; **দেহঃ**—শরীর; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করার

মাধ্যমে; অস্য—জীবের; বীজম্—বীজ; অবসীদতি—পতন ও মৃত্যু হয়; বৃক্ষ—গাছ; ধর্মঃ—প্রকৃতি অনুসারে।

অনুবাদ

দেহের প্রতি আসক্ত মানুষ বিপুল সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে যাতে তার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, সম্পত্তি, গৃহপালিত পশু, দাস দাসী, বাসগৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এবং অন্যান্য সব কিছুর মর্যাদা রক্ষা করা যায়। এই সমস্তই সে নিজের শরীরটির প্রীতিসাধনের জন্যই করে থাকে। বৃক্ষ যেভাবে মৃত্যুর পূর্বে ভবিষ্যতের বৃক্ষটির জন্য বীজ সৃষ্টি করে, তেমনই মৃত্যুমুখী দেহটিও নিজের সঞ্চিত কর্মফলের মাধ্যমে পরজন্মের জড় দেহটির বীজ সৃষ্টি করে থাকে। এইভাবে জড়জাগতিক অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে জড় দেহটি অবসন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

তাৎপর্য

কেউ যুক্তি দেখাতে পারে, "এতক্ষণ যে সমস্ত গুরুর উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে জড়জাগতিক দেহটি অবশ্যই সর্বোত্তম, যেহেতু এরই মাধ্যমে অনাসক্তি এবং বুদ্ধির সাহায্যে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে নিয়োজিত থাকার সক্ষমতা জাগে। তাই, দেহটি অনিত্য অস্থায়ী হলেও, যথেষ্ট যত্ন সহকারে, তার সেবাযত্ন করা কর্তব্য, নতুবা অকৃতজ্ঞতার অপরাধে দোষী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দেহটি এত রকম আশ্চর্য গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে নিরাসক্ত হয়ে থাকার পরামর্শ কেমন করে অনুমোদন করা যেতে পারে?" এর উত্তর এই শ্লোকটিতে দেওয়া হয়েছে। কোনও কল্যাণকামী শিক্ষকের পদ্ধতি অনুসারে অনাসক্তি ও জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা এই দেহটি প্রদান করে না; বরং এর মাধ্যমে এত দুঃখ এবং কষ্টের কারণ ঘটে যাতে যে কোনও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই জাগতিক জীবনধারার অনাবশ্যকতা বিষয়ে নিঃসন্দিহান না হয়ে পারা যায় না। যেভাবে কোনও গাছ পরবর্তী গাছের জন্য বীজ সৃষ্টি করে এবং তারপরে মৃত্যুবরণ করে, তেমনই দেহের কামনাবাসনাময় নানা ইচ্ছা থেকে কর্মফলের আরও শৃঙ্খল সৃষ্টি করার জন্য বদ্ধ জীবকে উদ্দীপিত করতে থাকে। অবশেষে দেহটি জড়জাগতিক জীবনধারার মাঝে অপরিসীম অগণিত দুঃখ কষ্টের পথ তৈরি করে দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, *দেহ* বলতে জড় দেহ এবং সূক্ষ্ম মানসিক দেহটিকেও বোঝায়। দেহ এবং আত্মার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে যারা পারে না, তারা অনর্থক মনে করে যে, দেহ এবং আত্মা সমপর্যায়ভুক্ত এবং ভাবে যে, দৈহিক ইন্দ্রিয় সুখানুভূতির মাধ্যমে যথার্থ সুখ ভোগ করা যেতে পারে।

কিন্তু যারা নির্বোধের মতো অনিত্য অস্থায়ী দেহটিকে সর্ববিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সত্তা বলে মনে করে, তাদের সাথে যে সব আত্ম-উপলব্ধিসম্পন্ন জীবাত্মার বুদ্ধিমানের মতো নিত্য আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে থাকেন, তাঁদের তুলনা করা চলে না।

শ্লোক ২৭

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তিঃ
বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ২৭ ॥

জিহ্বা—জিভ; **একতঃ**—এক দিকে; **অমুম্**—দেহ অথবা বদ্ধ জীবাত্মা যে দেহটিকে আত্মবুদ্ধিজ্ঞান করে; **অপকর্ষতি**—আকৃষ্ট করে নিয়ে চলে; **কর্হি**—কখনও; **তর্ষা**—তৃষ্ণা; **শিশ্নঃ**—যৌনাঙ্গ; **অন্যতঃ**—অন্য দিকে; **ত্বক্**—স্পর্শ অনুভূতি; **উদরম্**—উদর; **শ্রবণম্**—কান; **কুতশ্চিৎ**—অন্য কোথাও থেকে; **ঘ্রাণঃ**—গন্ধের অনুভূতি; **অন্যতঃ**—অন্য দিক থেকে; **চপল-দৃক্**—চঞ্চল দৃষ্টি; **ক্ব চ**—অন্য কোথাও; **কর্ম-শক্তিঃ**—শরীরের অন্যান্য সক্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; **বহ্ব্যঃ**—বহু; **সপত্ন্য**—উপপত্নীগণ; **ইব**—মতো; **গেহ-পতিম্**—গৃহস্থ; **লুনন্তি**—বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট করে।

অনুবাদ

বহুপত্নী থাকলে মানুষকে তাদের জন্য নিত্য বিব্রত হয়ে হয়। তাদের ভরণপোষণের জন্য তাকে দায়ী থাকতে হয়, এবং সমস্ত পত্নীরা তাকে বিভিন্ন দিকে নিত্য বিব্রত করতে থাকে, নিজ নিজ স্বার্থে বিবাদে রত হয়। ঠিক সেইভাবেই জড়েন্দ্রিয়গুলিও একই সঙ্গে বদ্ধজীবটিকে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ বিকর্ষণের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করতে থাকে। একদিকে জিহ্বা সুস্বাদু আহারাদির আয়োজনের জন্য তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে; তারপরে তৃষ্ণা তাকে মনের মতো পানীয় গ্রহণের জন্য টেনে নিয়ে যায়। একই সাথে যৌনাঙ্গগুলি তৃপ্তিসুখের জন্য বিব্রত করতে থাকে; আর স্পর্শেন্দ্রিয় পেতে চায় কোমল, ইন্দ্রিয় সুখকর বিষয়বস্তুর সঙ্গলাভ। উদর যতক্ষণ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ তাকে বিচলিত করতে থাকে, কানগুলি মনোমুগ্ধকর ধ্বনি শ্রবণের দাবি জানাতে থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় লুব্ধ হয় স্নিগ্ধ তৃপ্তিকর সুগন্ধের প্রতি, আর চঞ্চল চোখগুলি লালায়িত হয় মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের জন্য। এইভাবেই ইন্দ্রিয়াদি, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সকলেই তৃপ্তিসুখের বাসনায় জীবকে চতুর্দিকে টেনে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, এই শ্লোকটি উপলব্ধির পরে শরীরের একান্ত প্রয়োজনে যা কিছু সামান্য বস্তু গ্রহণ করতে হয়, তাই সবই আসক্তিশূন্য মনোভাব নিয়ে, গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত। যতদূর সম্ভব সরল সহজ উপায়ে কাজকর্মের মাধ্যমে শরীর উপযুক্ত এবং সক্ষম রাখা উচিত, এবং গুরুদেবের প্রতি সেবা নিবেদনের সেটাই মূল কথা। কেউ যদি শরীরটাকেই মনোনিবেশ সহকারে সেবা যত্ন করতে চায়, তা হলে তার বিবেচনা করা উচিত যে, বদ্ধ জীবের চেতনাকে শরীর একাদিক্রমে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, এবং তাই শরীরের দাসের পক্ষে ভগবদুপলব্ধি সম্ভব হয় না কিংবা শান্তিলাভ করাও যায় না।

শ্লোক ২৮

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্ ।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥ ২৮ ॥

সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করে; **পুরাণি**—জড় দেহ যেখানে বদ্ধ জীবের বাস; **বিবিধানি**—বিবিধ প্রকারের; **অজয়া**—মায়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে; **আত্ম-শক্ত্যা**—ভগবানের স্বীয় শক্তি; **বৃক্ষান্**—বৃক্ষসকল; **সরীসৃপ**—সরীসৃপ প্রাণীরা; **পশূন্**—পশুরা; **খগ**—পক্ষীরা; **দন্দশূকান্**—সর্পেরা; **তৈঃ তৈঃ**—শরীরের সকল প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে; **অতুষ্ট**—অপরিতৃপ্ত; **হৃদয়ঃ**—তাঁর হৃদয়; **পুরুষম্**—জীবনের মনুষ্য রূপ; **বিধায়**—সৃষ্টির মাধ্যমে; **ব্রহ্ম**—পরম তত্ত্ব; **অবলোক**—দর্শনলাভ; **ধিষণম্**—উপযুক্ত বুদ্ধি; **মুদম্**—তৃপ্তি; **আপা**—লব্ধ হয়; **দেবঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবাত্মা সকলের বসবাসের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর আপন মায়াময় শক্তি বিস্তারের মাধ্যমে অসংখ্য জীব-প্রজাতি সৃষ্টি করেছিলেন। বৃক্ষাদি, সরীসৃপকুল, পশু পাখি, সাপ ইত্যাদি নানা রূপ সৃষ্টি করবার পরেও ভগবান তাঁর অন্তরে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। তখন তিনি মানবজীবন সৃষ্টি করেন, যার মাধ্যমে বদ্ধজীব যথার্থ বুদ্ধি অর্জনের ফলে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তি লাভের সুবিধার জন্যই ভগবান বিশেষভাবে জীবনের মানব রূপটি সৃষ্টি করেন। তাই মানব জীবনের অবহেলা যে করে, তার নরকের পথ সে সুগম করে। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা*—"মানব জীবনের মধ্যেই নিত্য সত্তা বিশিষ্ট আত্মাকে উপলব্ধির উত্তম সম্ভাবনা থাকে" বৈদিক শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে—

তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্
ন বৈ নোঽয়ম্ অলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্
ন বৈ নোঽয়ম্ অলমিতি॥
তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা
অব্রুবন্ সুকৃতং বত॥

এই শ্রুতি মন্ত্রটির তাৎপর্য এই যে, গরু-ঘোড়ার মতো নিম্ন শ্রেণীর পশুরা বাস্তবিকই সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে যথাযথ উপযুক্ত নয়। কিন্তু মানব জীবনের মাধ্যমে জীব ভগবানের সাথে তার নিত্যকালের সম্পর্ক-সম্বন্ধের তত্ত্বটি উপলব্ধি করবার সুযোগ অর্জন করে। এই কারণেই, জড়েন্দ্রিয়গুলিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলা সকলেরই উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে, পরমেশ্বর ভগবান ক্রমশ আপনাকে তাঁর ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন যাতে মানুষ যথার্থ সুখ অনুভব করতে পারে।

ভগবানের জড়জাগতিক সৃষ্টির মাঝে জীবগণ এবং জড় পদার্থগুলি রয়েছে। জড়পদার্থগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্পবুদ্ধি জীবেরাই উপভোগ করতে চেষ্টা করে। অবশ্য, যারা চিন্ময় প্রকৃতির কোনও উপলব্ধির চেষ্টা না করে অন্ধের মতো কেবলই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে চলে, ভগবান তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয়ে থাকার জন্যই আমরা দুঃখকষ্ট পাই এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দময় ধামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও ধারণা করতেই চেষ্টা করি না। যদি আমরা ভগবানকে আমাদের ত্রাতা এবং পরমাশ্রয় রূপে স্বীকার করি, এবং তাঁর দিব্য আদেশ মান্য করে চলি, তা হলে অনায়াসেই আমরা সচ্চিদানন্দময় জীবনে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে পূর্ণ মর্যাদা ফিরে পেতে পারি। এই উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই ভগবান মানব জীবনের সৃষ্টি করেছেন।

শ্লোক ২৯

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যম পীহ ধীরঃ ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥ ২৯ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করার পরে; সু-দুর্লভম্—যা লাভ করা অতি কঠিন; ইদম্—এই; বহু—অনেক; সম্ভব—জন্ম; অন্তে—পরে; মানুষ্যম্—মানবজন্ম; অর্থ-দম্—যাতে বিশেষ মূল্য আরোপিত হয়; অনিত্যম্—অস্থায়ী; অপি—যদিও; ইহ—এই জড় জগতের মধ্যে; ধীরঃ—স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন; তূর্ণম্—অচিরে; যতেত—চেষ্টা করা উচিত; ন—না; পতেৎ—পতিত হয়েছে; অনু-মৃত্যু—নিত্যই মৃত্যুমুখী; যাবৎ—যতক্ষণ; নিঃশ্রেয়সায়—পরম মুক্তির জন্য; বিষয়ঃ—ইন্দ্রিয় ভোগ; খলু—সর্বদা; সর্বতঃ—সর্ব অবস্থায়; স্যাৎ—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

বহু বহু জন্ম ও মৃত্যুর পরে কোনও জীব অতি দুর্লভ মানব রূপ লাভ করতে পারে, আর যদিও এই মানব জন্ম অস্থায়ী, তা হলেও এই মানব জন্মের মাধ্যমেই জীব তার জীবনের চরম সার্থকতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে থাকে। তাই যে কোনও স্থিরবুদ্ধি মানুষেরই যথাশীঘ্র সম্ভব উদ্যোগী হয়ে এই অনিত্য অস্থায়ী দেহটির পতন এবং মৃত্যুর পূর্বেই জীবনের পরম সার্থকতা অর্জনের জন্য দ্রুত চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবিকই, অতি জঘন্য জীবন প্রজন্মেও ইন্দ্রিয় উপভোগের সুযোগ থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন একমাত্র মানবজাতির পক্ষেই সম্ভব হয়।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক জীবনধারার অর্থ জন্ম এবং মৃত্যুর পুনরাবর্তন। সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, শূকর এবং কুকুরদের মতো নিম্ন স্তরের জীবনধারাতেও ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রচুর সুযোগ থাকে। এমন কি সাধারণ মাছিরাও মৈথুন জীবন যাপনে ব্যস্ত থাকে এবং তাই তারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। মানব জীবনে অবশ্য পরম তত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষমতা পাওয়া যায় এবং তাই বিপুল দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেহেতু মূল্যবান মানবজীবন নিত্যস্থায়ী হয় না, সেই কারণেই জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা স্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টায় যথাকর্তব্য পালন করাই আমাদের আশু কর্তব্য হওয়া উচিত। মৃত্যু আসন্ন হওয়ার পূর্বেই, আমাদের সেই বিষয়ে যথার্থ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্ব সহকারে অনুশীলন করা কর্তব্য।

ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভের মাধ্যমেই মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। তাদের সঙ্গ না পেলে, মানুষের পক্ষে জীবনের নির্বিশেষ নিরাকার তত্ত্বমূলক ভ্রান্ত ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে, যে ধারণার ফলে মানুষ ক্রমশ পরম তত্ত্বের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের পথ থেকে বিভ্রান্ত হতে থাকে। কিংবা, পরমতত্ত্বের উপলব্ধি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে, মানুষ আবার ইন্দ্রিয় উপভোগের অনর্থক প্রচেষ্টার জীবনধারায় ফিরে যায়। উপসংহারে বলা যায় যে, অভিজ্ঞ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ভগবদ্ভক্তবৃন্দের পথ নির্দেশের মাধ্যমেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করার উদ্দেশ্যেই জীব পরম সৌভাগ্যস্বরূপ এই মানবরূপ জীবনধারার সুযোগ লাভ করে থাকে।

শ্লোক ৩০

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি ।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঞ্জাত**—পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করার মাধ্যমে; **বৈরাগ্যঃ**—অনাসক্তি; **বিজ্ঞান**—আত্মোপলব্ধির তত্ত্ব; **আলোকঃ**—অন্তর্দৃষ্টি লাভের; **আত্মনি**—পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায়; **বিচরামি**—আমি বিচরণ করি; **মহীম্**—পৃথিবীতে; **এতাম্**—এই; **মুক্ত**—বন্ধনহীন; **সঙ্গঃ**—আসক্তি থেকে; **অনহঙ্কৃতঃ**—মিথ্যা অহম্‌বোধ শূন্য হয়ে।

অনুবাদ

আমার পারমার্থিক গুরুবর্গের কাছ থেকে শিক্ষালাভের মাধ্যমে, আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছি এবং পারমার্থিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত অর্জন করে, নিঃসঙ্গভাবে নিরহঙ্কার হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছি।

শ্লোক ৩১

ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্ ।
ব্রহ্মেতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **অকস্মাৎ**—একজনের কাছ থেকে; **গুরোঃ**—গুরুদেব; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **সুস্থিরম্**—অতি সুদৃঢ়; **স্যাৎ**—হতে পারে; **সু-পুষ্কলম্**—অতি সম্পূর্ণ; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **এতৎ**—এই; **অদ্বিতীয়ম্**—অদ্বিতীয়; **বৈ**—অবশ্যই; **গীয়তে**—গুণান্বিত হয়; **বহুধা**—নানাভাবে; **ঋষিভিঃ**—ঋষিবর্গের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমতত্ত্ব যদিও এক এবং অদ্বিতীয়, তা সত্ত্বেও ঋষিবর্গ সেই পরমতত্ত্বকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করেছেন। সেই কারণেই কোনও একজন মাত্র গুরুর কাছ থেকে সুদৃঢ় অর্থাৎ সুসম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা কারও পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন— "বহু পারমার্থিক গুরু মানুষের প্রয়োজন, এই মন্তব্যটি অবশ্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, যেহেতু বাস্তবক্ষেত্রে অতীতের সমস্ত মহান ঋষিতুল্য মানুষেরাই বহু পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেননি, বরং একজন গুরুদেবই স্বীকার করেছিলেন। *গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ*, 'মুনিঋষিগণ নানাভাবে পরমতত্ত্বের গুণবর্ণনা করেছেন' কথাগুলি থেকে বোঝানো হয়েছে যে, পরমতত্ত্বের সাকার এবং নিরাকার উপলব্ধি হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনও কোনও মুনিঋষি কেবল ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি বর্ণনা করে থাকেন, যার কোনও পারমার্থিক চিন্ময় বৈচিত্র্য নেই, অথচ অন্যান্যেরা ভগবানকে সবিশেষ পরমেশ্বর ভগবান রূপে ব্যাখ্যা করেন। তাই, শুধুমাত্র অনেকগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বীর কাছ থেকে ব্যাখ্যা শ্রবণ করলেই, কারও পক্ষে বাস্তবিকই জীবনের সর্বোত্তম শিক্ষালাভ করতে পারা যায় না। সর্ব বিষয়ে জড়জাগতিক ভাবধারাসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার দিকে জীবগণের প্রবণতা রোধ করবার জন্যই কেবলমাত্র ভিন্ন মতাবলম্বী পারমার্থিক গুরুবর্গের তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়। আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন পরমার্থবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস গড়ে তোলেন এবং সেই পর্যায় পর্যন্তই সেইগুলি স্বীকার করা যেতে পারে। তবে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কোনও পারমার্থিক গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে যে জ্ঞান প্রদান করেন, শেষ পর্যন্ত সেই জ্ঞানই প্রামাণ্য তত্ত্ব রূপে স্বীকার করতে হয়।"

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন, "একজন মাত্র পারমার্থিক গুরুদেবকে স্বীকার করাই যেহেতু সকলের সাধারণ উপলব্ধিগ্রাহ্য মতবাদ, তা সত্ত্বেও সাধারণ জড় সামগ্রীর রূপে বিভিন্ন বিষয়াদিকে বহু গুরুবর্গ বলে মেনে নিয়ে সেইগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কেন? তার ব্যাখ্যা এই যে, বিভিন্ন সাধারণ বিষয়াদি থেকে উদ্ভাসিত শিক্ষাপ্রদ বিষয়াদির মাধ্যমে পূজনীয় পারমার্থিক গুরুদেব মানুষকে জ্ঞানের নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতে পারবেন। তাই ব্রাহ্মণ অবধূত পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, নিজের আচার্যের কাছ থেকে মানুষ যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দৃঢ়প্রত্যয় হওয়া সম্ভব হয় এবং

তার ফলে প্রকৃতির মাঝে নানা প্রকার সাধারণ বিষয়বস্তুগুলি লক্ষ্য করার মাধ্যমে শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করবার প্রবৃত্তি পরিহার করা সম্ভব হয়। নিজের গুরুদেবের শিক্ষা-উপদেশাবলী উপলব্ধি ছাড়াই কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করা অনুচিত। শিষ্যকে অবশ্যই চিন্তাশীল হতে হবে এবং তার গুরুদেবের কাছ থেকে যা কিছু শুনেছে, চতুর্দিকে পৃথিবীর সব কিছু অবলোকনের মাধ্যমে, নিজ বুদ্ধির সাহায্যে সেইগুলি উপলব্ধি করতে হবে। এই বিচারে, বহু গুরু মান্য করা যেতেও পারে, তবে পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে, সেইগুলির বিরুদ্ধে প্রচারিত ভাবধারার অনুসারী কোনও গুরু স্বীকার করা উচিত নয়। অপরদিকে বলা যেতে পারে যে, নিরীশ্বরবাদী কপিল ঋষির মতো মানুষদের কোনও কথাই শোনা অনুচিত।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"*শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—'সুতরাং জীবনে সর্বোচ্চ সার্থকতা অর্জনে বাস্তবিকই কেউ অভিলাষী হলে তাকে কোনও সদ্‌গুরুর আশ্রিত হতে হবে।' তেমনই, এই স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বলেছেন, *মদভিজ্ঞানং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্*—'আমাকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছেন যে পারমার্থিক সদ্‌গুরু এবং যিনি আমা হতে অভিন্ন, তাঁকে সেবা করাই উচিত।' বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে এই রকম আরও বহু শ্লোকাদি রয়েছে, যেখানে নির্দেশ করা হয়েছে যে, একজন মাত্র পারমার্থিক সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত হওয়াই বিধেয়। এইভাবে আমরা আরও অসংখ্য মহামুনিঋষিবর্গের দৃষ্টান্ত পেয়েছি, যাঁরা একজনের বেশি পারমার্থিক গুরু গ্রহণ করেননি। তাই, বাস্তবিকই একজন মাত্র পারমার্থিক সদ্‌গুরু স্বীকার করাই আমাদের উচিত এবং তিনি যে বিশেষ মন্ত্রটি প্রদান করেন, তা গ্রহণ করে আমাদের জপ করা কর্তব্য। আমি নিজে এই নীতি মেনে চলি, এবং আমার পারমার্থিক গুরুদেবের বন্দনা করে থাকি। অবশ্যই, নিজের আচার্যের বন্দনা করবার সময়ে, ভাল এবং মন্দ দৃষ্টান্তগুলির সাহায্য গ্রহণ করা চলতে পারে। সদাচারমূলক দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করার মাধ্যমে মানুষ ভগবদ্ভক্তিসেবা অনুশীলনের পথে দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে উঠবে এবং নেতিবাচক দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করে মানুষ অগ্রিম সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে বিপদাশঙ্কা পরিহার করতে পারবে। এইভাবেই, মানুষ বহু সাধারণ জাগতিক সামগ্রীকেও শিক্ষাগুরুর মতো বিবেচনা করে সেগুলিকেও সদ্‌গুরু মনে করতে পারে, কিংবা পারমার্থিক অগ্রগতির পথে মূল্যবান শিক্ষা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সেইগুলিকে গুরুরূপে মর্যাদা প্রদান করতেও পারে।"

এইভাবেই ভগবানের নিজ উক্তি—*মদভিজ্ঞানং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্* (*ভাগবত* ১১/১০/৫) অনুসারে, এমন একজন মাত্র পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হওয়া উচিত, যিনি ভগবানের পরম সত্তার পূর্ণজ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁকে *মদাত্মকম্* রূপে বিবেচনা করার মাধ্যমে অর্থাৎ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান থেকে তাঁকে অভিন্ন জ্ঞানে, আন্তরিকভাবে বন্দনা করতে হবে। অবধূত ব্রাহ্মণের উপদেশাবলীর মাধ্যমে ভগবান যে সকল উপদেশাবলী উপস্থাপন করেছেন, এই মন্তব্যটি তার বিরোধীতা করে না। যদি মানুষ তার আচার্যের উপদেশাবলী গ্রহণ করার পরে, সেইগুলি শুধুমাত্র তার মস্তিষ্কের মধ্যে তাত্ত্বিক নীতিকথার মতো আবদ্ধ করে রেখে দেয়, তা হলে তার সামান্যই উন্নতি হবে। যদি যথার্থই দৃঢ়ভাবে প্রগতি লাভ করতে হয়, এবং পূর্ণজ্ঞান অর্জনের অভিলাষ থাকে, তা হলে নিজের আচার্যের উপদেশাবলীর প্রতিফলন সর্বত্র তাকে লক্ষ্য করা শিখতে হবে; তাই, যে কেউ বা যা কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন সদ্‌গুরু তথা আচার্যের বন্দনার পথে উদ্দীপনা জাগাতে পারে, যথার্থ বৈষ্ণব তা সব কিছুর প্রতি বা তেমন যে কোনও জীবের প্রতি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকে।

ব্রাহ্মণের উপদেশের মাধ্যমে যে সকল বহু গুরুবর্গের উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলির কিছু শুভ নির্দেশাত্মক এবং কিছু অশুভ নির্দেশাত্মক। পিঙ্গলা বারনারী এবং কুমারী বালিকার শাঁখাচুড়ি বর্জনের কাহিনী থেকে যথাযথ আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, অথচ হতভাগ্য পায়রাগুলি আর নির্বোধ মৌমাছির কাজকর্মে; পরিত্যজ্য আচরণের সূত্র লাভ করা যায়।

উভয় ক্ষেত্রেই, মানুষের পারমার্থিক জ্ঞান সমৃদ্ধ হতে পারে। অতএব, এই শ্লোকটিকে ভগবানের উক্তি, *মদভিজ্ঞানং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্* (*ভাগবত* ১১/১০/৫) অনুসারে কোনও ভাবেই বিপরীতার্থক বলে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ ।
বন্দিতঃ সুর্চিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলার পরে; **সঃ**—সে; **যদুম্**—যদুরাজকে; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **তম্**—রাজাকে; **আমন্ত্র্য**—বিদায় জানিয়ে; **গভীর**—অতি গভীর; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **বন্দিতঃ**—বন্দনা জানিয়ে; **সু-অর্চিতঃ**—যথাযথভাবে অর্চনার মাধ্যমে; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **যযৌ**—তিনি চলে গেলেন; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট মনে; **যথা**—যেমন; **আগতম্**—তিনি এসেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—এইভাবে যদুরাজকে বলার পরে, জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ সেই রাজার প্রণতি ও বন্দনা গ্রহণ করে, প্রীতিলাভ করলেন। তারপরে বিদায় জানিয়ে তিনি যেভাবে এসেছিলেন, সেইভাবেই চলে গেলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে প্রমাণ উল্লেখ করেছেন যে, সেই ব্রাহ্মণ অবধূত প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীদত্তাত্রেয়রই অবতার ছিলেন। ভাগবতে (২/৭/৪) উল্লেখ আছে—

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ।

"বহু যদুগণ, হৈহয়গণ প্রমুখ এমনই শুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে, ভগবান শ্রীদত্তাত্রেয়র পাদপদ্মের কৃপায় তারা জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় প্রকার আশীর্বাদই লাভ করতে পেরেছিল।"

এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, দত্তাত্রেয়র চরণস্পর্শে যদু পবিত্র হয়ে উঠেছিলেন, এবং তেমনই এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—*বন্দিতো স্বর্চিতো রাজ্ঞা*—যদুরাজ সেই ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম বন্দনা করেছিলেন। তাই, শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, অবধূত ব্রাহ্মণ যথার্থই স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানই, এবং তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩৩

অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্বেষাং নঃ স পূর্বজঃ ।
সর্বসঙ্গবিনির্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ ॥ ৩৩ ॥

অবধূত—অবধূত ব্রাহ্মণের; **বচঃ**—কথাবার্তা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **পূর্বেষাম্**—পূর্বপুরুষগণের; **নঃ**—আমাদের; **সঃ**—তিনি; **পূর্বজঃ**—স্বয়ং প্রপিতামহ; **সর্ব**—সকলের; **সঙ্গ**—আসক্তি থেকে; **বিনির্মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **সম-চিত্তঃ**—পারমার্থিক স্তরে তাঁর চেতনা সুস্থির করে এবং সর্বত্র সমভাবাপন্ন হয়ে; **বভূব**—তিনি হলেন; **হ**—অবশ্যই।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, অবধূতের কথাগুলি শুনে, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রপিতামহ ঋষিতুল্য যদুরাজ সকল প্রকার জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হলেন, এবং তাই তাঁর মন পারমার্থিক স্তরে যথাযথভাবে স্থিত হল।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান তাঁর নিজ রাজবংশ অর্থাৎ যদুবংশের সুখ্যাতি ব্যক্ত করেছেন, কারণ ঐ রাজবংশে বহু মহান আত্মজ্ঞানসম্পন্ন রাজারা আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদুরাজকে দত্তাত্রেয় এক অবধূত ব্রাহ্মণরূপে উপদেশ প্রদান করার ফলে রাজা কেবলমাত্র ভগবানের সৃষ্টি অবলোকনের মাধ্যমে নিরাসক্তির পারমার্থিক স্তরে তাঁর চেতনা সুস্থির করতে শিখেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'জড় জাগতিক সবকিছু থেকে নিরাসক্তি' নামক নবম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।